বিষ্ণু দে অনুদিত **এলিঅটের কবিতা**

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ-কে

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৬০
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০।২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
নিউ প্রাইমা প্রেস
১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট

দাম দুটাকা

সূচীপত্র

টমাস্ স্টার্নস্ এলিঅট

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে মৌল প্রভেদ দুশোবছরের রাজদণ্ডের প্রতাপেও ঘোচেনি, সে দুস্তর ব্যবধানবশত সাহিত্যের গৌণ তথ্যের মাহাত্ম্য শুধু সাহিত্য-বিচারেই আবদ্ধ। বাংলাসাহিত্যে এলিঅট তাই বলাই বাহুল্য মার্ক্সবাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদিনী রাত বটে। মার্ক্সের পুঁথিপত্রে এল সারা য়ুরোপ, য়ুরোপের আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এল সেই নিরীক্ষায় মধ্যে দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের যে সব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝবার চেষ্টা। সে চেষ্টায় গত শতকের য়ুরোপের, বিশেষত ফ্রান্সের দান নগণ্য নয়।

আশ্চর্যের কথা, আমাদের যে গুরুজন ফরাসী সংস্কৃতির বাংলা স্তম্ভপ্রায়, সেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বেও এই উনিশশতকের শেষ অর্ধেকের এবং এ-শতকের ফ্রান্স প্রায় নেই। বদ্‌লেয়র ও তাঁর অনুবর্তী ফরাসী কাব্যসাধনা; গতিয়ে, র‍্যাঁবো, মালার্মে, লাফর্গ্, ভালেরি অবধি কাব্যাদর্শের যে বিপ্লবপ্রয়াস—তার প্রভাব এদিকে এমেরিকার পাউণ্ড এলিঅট থেকে ওদিকে প্রথম বিপ্লবীকবি মায়াকফস্কি ও পাস্টেরনাক পর্যন্ত প্রসারিত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মহাজনরা এঁদের বার্তা আনেন নি, রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের ডে প্রফুণ্ডিসের বাণী এনেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী অস্কার ওয়াইল্ডের ফ্রান্সের।

এই য়ুরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হল দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি এস্ এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতার প্রথম আলোচনা বোধহয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে, যা পরে ছাপা হল 'কাব্যের মুক্তি' নামে। সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, মুখ্যত ১৯২৫ এর কবিতাবলী এবং 'দি সেক্রেড উড্' আর 'ক্রাইটেরিঅন' পত্রিকা-সমেত। বিশ দশকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই, বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই, স্নায়ু তখন এক পাহাড়ে চূড়ায়, বেটোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয়, নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনো তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখনো প্রায় সেই তিমিরেই,

আজ যে তিমিরে। নেতির সংযমে শিক্ষা সুরু হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হল কর্মিষ্ঠ, সচল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। জ্ঞানে হলুম আমরা 'গেরোনশন' থেকে 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এ উপনীত। তাই থেকে এল মীরাটযুগে এরিয়েল কবিতাবলী, ভদ্র অসহযোগের নৈরাশে এল 'অ্যাশ্ ওএডনেসডে,' যন্ত্রণার মুঠিতে এল আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।

ব্যাপারটাই নাটুকে—বাঙলাদেশে এলিঅট। এই বাঙলাদেশের বুকেই—যদিচ এক যুগান্তে জনযুদ্ধের যুগে—আরেক কবি, সুকুমার তরুণ কিন্তু প্রতিভা-সম্ভব ইংরেজ কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাথা কোটেন। এলন্ লুইস্ দেখেছিলেন যে ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে রুটি নয়, পাথর। বিরোধে তাঁর জর্জর মন তাই ত্রাহি ত্রাহি করেছিল, তাই তাঁর করুণ শেষ হল ব্যর্থ মৃত্যুতে, আরাকানের খাদের ধারে দাঁড়িয়ে রিভলভরে নিজের প্রাণদানে। লুইস্ তাই 'ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া'র আর্চরকে লেখেন :

'And India is a hard country to mature in. There is so much to anger you in the human scene, so much to dismay you in the social scene, so much to humble you in the universal scene.... But what untouched wealth the Indian writer has—if only the climate of the soul was more conducive to a free and deep development of his material. Something seems to have gone wrong out here, and everything is tainted.'

এ বোধ প্রাথমিক বোধ, এ ছাড়া মানসলোকের সেই জলবায়ু হয় না, যাতে কাব্য ও কবির বিকাশ সুযোগ পায়। এই বোধই ক্লাইভ্ ব্র্যানসনের পত্রাবলীকেও দিয়েছে তার মহৎ মানবমর্যাদা, জুগিয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের চিত্রবস্তু। ব্র্যান্‌সনের কাব্যরচনায় কেন ঐ সুস্থ জীবনদর্শন সমাহিত হয় নি, কেন তাঁর কাব্য মামুলি, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মায়া ও সত্তা-র অসামান্য লেখক স্পেনযুদ্ধের বীর কডওয়েলের স্বকীয় কাব্যের বুর্জোয়া রূপবিচারের মধ্যেও এ সমস্যার উভমুখ প্রশ্ন।

এলিঅট আমাদের জানালেন যে কাব্যে বড়ো বিবেচ্য ঐ মানসের জলবায়ু,

জানালেন রচনাবস্তুর স্বতন্ত্র ও গভীর বিকাশের বিষয়ে সজ্ঞানতার প্রাথমিক সার্থকতা। সেই প্রস্তুতির ভিত্তিতেই আজ আমরা বলতে পারি লুইসের ভাষায়:

'Don't you think India has reached the stage, where the lotus becomes as much a 'lie' as the rose in Europe (Mallarmé's theory) and there is need for a screeching sweated realism also, as much in the village as in the city. And why is this realism so hard to attain? The sun teaches it everyday.'

রৌদ্রের এ অভিযান আরম্ভ শিক্ষিত বাবু-সমাজের যে রাত্রিশেষে, সে রাত্রি আশা-ভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার, যে আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের প্রভাব সেখানে রূপকবৎ, সে রূপক খুলল গান্ধীজির নীতির গোধূলিতে, রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলাহাওয়ার ধ্যান ধারণায়। সাধারণ্যেই এলিঅট পেলেন সমব্যথী, যদিচ আমরা ছিলুম তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। আত্মসচেতনতা ছিল, তবে, তখনো সেটা বিচ্ছিন্ন— প্রুফ্রকের মতো। আত্মসচেতনতা তখনো তাই বিড়ম্বনা, বিরহী প্রেমিকের মতো। কিন্তু তা ছিল সৃষ্টিময়; প্রগতির প্রথম ক্ষেপ, যদিচ হয়তো আত্মসচেতনতা তখনো সেই সম্বন্ধস্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয় নি, যেখানে হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তখনো আমাদের পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক্, ভালেরির সাপের মতো, আমাদের আত্মস্থতা তখনো প্রায় হিন্‌ডেন্‌বর্গ জার্মেনিতে রিল্‌কের সুদূর-পিয়াসী টিউটনিক আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ্য কিম্বা ইয়েট্‌সের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজা-রাজড়ার কুহকজালের যন্ত্রণাসম্ভোগ।

এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়বোধে, যথা, বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন তা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে। সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্য অর্থাৎ এক প্রকার কর্মের বীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুইই করেন। অজ্ঞাতসারেই এলিঅটের সমালোচনার সূত্রপাতে

মার্কস্ অঙ্গীকৃত, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর কাব্যচর্চা আরম্ভ, যদিও সে সত্য তিনি জানেন না। বা মানেন না।

আরাগঁ-র বিখ্যাত 'এল্সার চোখ' নামক কবিতাগ্রন্থের সমালোচনামূলক ভূমিকায় এই সত্য প্রকাশিত। সাম্প্রতিক ফরাসী কাব্যের মুক্তিচেষ্টার পটে তাঁর মুক্তিসন্ধান, ফরাসীকাব্যের ইতিহাসচর্চা, কাব্যের ঐতিহ্যে সাম্যবাদী কবির প্রতিরোধ ও প্রেম তাই স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মূল্যবান। আরাগঁ প্রসঙ্গত বলেছেন: 'তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এইই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ। এবং এই মুক্তিতেই, এই প্রকৃত স্বাধীনতাতেই সম্ভব আমার যথাযথতার প্রয়াস, এই দীর্ঘ পথ (প্রায় পঞ্চাশ বছরের) অতিক্রম প্রয়োজন ছিল, বরাবরই এ সমর্থনীয় ছিল, হুগোর হাতে ধ্রুপদী পদ্যের ভাঙাগড়া থেকে প্রতীকীদের মুক্তছন্দ অবধি—ভেরলেনী ভ্রান্তি আর সেইসব মিল বা যমকঘটিত কসরতের পরে।

'এর প্রয়োজন ছিল—মুক্তছন্দের গলিত-দন্ত চিরুনি থেকে অর্ধ শতাব্দীর একশো রকম কাব্যাদর্শের, 'ইলুমিনাসিওঁ' থেকে স্যুররেয়ালিস্ট পর্যন্ত। এবং আজ যখন দেখি কেউ কেউ অযথা রাজনৈতিক আওয়াজে গত অভিজ্ঞতার এটা কিংবা ওটা বাতিল করেন এবং বলেন যে আমাদের জাতীয় প্রতিভা শুধু চালু পদ্যের সড়কে চলবে তখন আমি হেসে ফেলি আর পেড্‌লেই পিয়ানো বাজায় যে মূর্খেরা ভাবে, তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছা হয়: খোকা হাত দিও না। এই দীর্ঘ অভিযান প্রয়োজন ছিল, যাতে আমরা সচেতনভাবে ফরাসী কাব্যের দীর্ঘ ইতিহাস ধরতে পারি, পুনরাবৃত্তির জন্যে মুখস্থ বিদ্যায় নয়, কিংবা ডিগ্রী পেতে নয়, ফ্রান্সের একটা গভীর অর্গ্যানিক অনুভূতি আয়ত্তে আনতে। আজকাল যে এই কবিদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত গীতচেতনা-কে দাবাবার নির্বোধ ফ্যাশন কোথাও কোথাও চালু হচ্ছে সে ব্যাপারে দুঃখ হয়। এ ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা আমার কর্তব্য। আমি জানি এখন বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা কথা-দুটো অপব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। আমি আস্তাকুঁড় অবধি এ দুটো অনুসরণ করে সম্মানিত হতে চাই। সকলেই যদি যে কর্মক্ষেত্রে যিনি অভিজ্ঞ,

বিশেষজ্ঞ সেই সেই ক্ষেত্রে তাই করেন, তাহলে তুনিয়া জায়গাটার কিছু উন্নতি হয় এবং মুর্খের হাততালি কুড়িয়ে যে সব গাঁওয়ার হাতুড়ে-র মাহাত্ম্য কীর্তন করে, তাদের সংখ্যাও কমে।"

তাই আরাগঁ বলেছেন: "কাব্যের ইতিহাস তার টেক্‌নীকের ইতিহাস। যারা আমাদের নীরব করতে চায় তারা সেই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লেখক, যারা কিছুই নির্মাণ করে নি, যারা শুধু গোনা কয়েক ছক টেনে প্যাঁচ কষেই ক্ষান্ত হয়। আমি তো আজ অবধি কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে না ভেবে, আগের লেখা আর পড়া কাব্যাবলী বিষয়ে সচেতন না হয়ে কোনো কবিতা লিখি নি।"

আরাগঁ বলেন: "আধুনিক কবিতান্দোলনে আমি এতো গভীরভাবে এবং নিজেই অংশগ্রহণ করেছি যে তাঁর সাময়িক রূপগুলিতে ক্লান্ত হয়ে যখন আমি তার দীর্ঘ বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার, লোকোত্তর ভাষার অভিজ্ঞতার সন্ধানে একাগ্র তখন আমার পক্ষে এমন পথ ধরা সম্ভব নয়, যা অন্যের পক্ষে সার্থক হলেও আমার সাহিত্য সাধনায় পরধর্মী।"

তাই আরাগঁ শেষে বলেছেন যে তার কণ্ঠ রোধ করা যাবে না: "আমার গান চলবে, সেও তো নিরস্ত্র মানুষের একটা অস্ত্র, কারণ সে মানুষেরই গান, যার পক্ষে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমি গাই কারণ ঝড়ের সে শক্তি নেই যে সে আমার গানকে ডুবিয়ে দেয় আর কাল যদি তোমরাও তাই করো, তাহলে আমার প্রাণও নিও কিন্তু গান আমার চল্‌ল অনির্বাণ।"

আরাগঁ-র কথা তোলার কৈফিয়ৎ দেওয়া বাহুল্য। তাঁরই দেশে প্রায় সত্তর বছর ধরে' চলেছে আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা, তিনি নিজে বিখ্যাত লেখক, কর্মী, সাংবাদিক, সোভিয়েটের বাইরে সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে এলুয়ারের পরে তিনি অন্যতম। কাব্যের স্বকীয় গতি, ইতিহাস এবং আত্মসচেতন কবিস্বরূপের আলোচনা তাই তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিণতি পায়। বাংলা কাব্য অবশ্যই ফরাসী কাব্যের সমগোত্র নয়, তবু প্রগতিশীল সাহিত্য বিচারে তাঁর আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য মূল্যবান।

এ সাক্ষ্য যে পৌঁছল আমাদের সাহিত্যিক অন্তঃপুরে তার কারণ শুধু একবিশ্বে তুনিয়ার সঙ্কোচন নয়, জনযুদ্ধ নয়। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই যে সাহিত্যজগতে আমরা এই পথে আনাগোনা সুরু করেছিলুম অনেক আগেই, ১৯১৩ সালে বঙ্গীয়

সাহিত্যসম্মেলনে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান তার নির্দেশ। এবং উত্তরকালে নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সমালোচক ও কবি এলিঅট।

আরাগঁ বলেছেন কাব্যসাহিত্যে কোনো ডগ্‌মাই প্রযোজ্য নয়। এলিঅটের ডগ্‌মা অবশ্যই আমাদের পক্ষে অগ্রাহ্য। ভৌগোলিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্থূলকারণেই অগ্রাহ্য, আমাদের জীবনে ও জীবিকাতেই এলিঅটের ডগ্‌মার অসারতা স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য স্বীকার্য। আমাদের পিতা-পিতামহেরা সাহিত্য বলতে বুঝতেন মিলটন্‌, শেক্‌সপিয়র এবং তাও এলিজাবিথান্‌ জগত থেকে বিচ্যুত একক শেক্‌সপিয়র এবং শুধু উনিশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য। মাইকেল অবশ্য য়ুরোপীয় পটও চিনতেন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় জগতে বিচরণ করতেন, তবু মোটামুটি অগ্রজেরা কাব্যজিজ্ঞাসাকে সীমাবদ্ধই রেখেছিলেন। উনিশশতকের আগে ও শেষ দিকে এবং ইংলণ্ডের বাইরে তেয়ন্‌ ও আমিয়েল ছাড়া যে য়ুরোপ ছিল সে বিষয়ে যথোচিত চর্চার সুযোগ সেকালে ছিল না। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বিরাট স্বয়ম্ভর প্রতিভার বিচার এ প্রসঙ্গে উঠছে না।

ইংরেজি, য়ুরোপীয় এবং আমাদের নিজেদেরই সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানে তাই এলিঅটের নিদর্শন শ্রদ্ধেয়। এবং এ সন্ধান এক রকম নির্মাণ, কর্মিষ্ঠ পরিবর্তন, এ কথা এলিঅটই অতো ভালো করে সাহিত্যপ্রসঙ্গে বলেন প্রথমে। আরাগঁ যখন সেই কথা আজ বলেন তখন আমরা প্রস্তুত থাকি এই মার্কসীয় প্রস্তাবের জন্যে। কারণ কথাটা মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌সেই সম্পূর্ণ, যান্ত্রিকতা বা আদর্শবাদ কোনোটাতেই নয়।

তাই পটভূমি ভিন্ন হলেও এলিঅটের অভিজ্ঞতার তুল্য মেলে আমাদের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মূল্যনির্ধারণ বাদ দিয়েই বলা যায়। এক হিসেবে আমাদের সুবিধাও আছে ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায়। ঘোর দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে গিয়েও ভারতীয় জীবনে এখনও একটা বিস্তৃত অপিচ স্থূল ঐতিহ্য আছে, সোফিষ্টিকেশন বা জীবনচর্যার একটা সভ্য কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্য। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ী গানে তার প্রমাণ। অবশ্যই সে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় মেলে না, সে

ঐতিহ্যব্যবহারের পথ আপাতসহজ নাও হতে পারে, এবং সে বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তুল্যমূল্যও নয়।

সংস্কৃত ব্রহ্মণ্য ও দেশজ সংস্কৃতির যোগাযোগে দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে নানা যুগে নানাভাবে তার নানা রূপ খুলেছে; অনেক সময়ে অবশ্য সে রূপ অভ্যাসের সহজ সংকেতিত মার্গে পড়ে ছকে পরিণত হয়েছে। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ অভ্যাসিকতার পাঁচিল ভেঙে আমাদের মুক্তি দিলেন। এলিঅটের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ প্রাচীরের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শিখলুম ঐ মুক্তিকে ব্যবহার করতে, ধারাবহ করতে।

এলিঅটের নির্দিষ্ট দান সার্থক তাই রামমোহনেতর ঐতিহ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা ও পুরুষার্থের গণ্ডী বিস্তারে এবং তারই সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর করায়। অর্থাৎ নিজেদের ও বিশ্বের বিষয়ে আমাদের চৈতন্য ক্ষুরধার করায় অবস্থাটা করুণ বা বীরত্বব্যঞ্জক—যে দৃষ্টিতে দেখি। বীরত্বের দিকটাই আমাদের কাছে মহার্ঘ—সন্ধানের, নির্মাণের কর্মিষ্ঠ দিকই।

তাই আমরা বুঝলুম যে কবিতা একটি বিশেষ কাব্যবস্তু এবং বিশেষ কাব্যবস্তু এবং প্রক্রিয়া দুইই। বুঝলুম যে এই প্রক্রিয়ায় চাই যথাসম্ভব চিত্তশুদ্ধি; এর বিন্যাসে এমন কি প্রত্যক্ষ লিখনকর্মের ব্যাপারেও। আবার এও জানলুম যে 'শুদ্ধকাব্য' প্রযুক্ত হতে পারে অশুদ্ধভাবে, যেমন যে কবিতা প্রক্রিয়ায় রূপায়নে সৎ, তার প্রয়োগ হতে পারে কাব্যের বাইরেও। প্রায় ক্রোচের মতো পাঠক হয়ে উঠলুম আমরা, দান্তের ক্রোচের মতো। এবং মার্ক্‌স্ এঙ্গেলসের শেক্‌সপিয়র, বালজাক্, গোয়টে, হাইনে কিম্বা ইবসেন বিচার বোধ্য হল আমাদের কাছে।

তাই এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তাঁর রীতি আমাদের সহায় এমন কি তাঁর কবিতার অলঙ্কার, অঙ্গবিন্যাস, জগৎ ভিন্ন হলেও। কাব্যের মুক্তির চেতনায় ফল হয়েছে এই। প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই "রাজর্ষিদের যাত্রা"র মতো ক্রিস্টিয়ান্ কবিতা গান্ধীজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদসম্ভাব্যতা পায়, "কোরিওলান" পায় ইন্‌টেরিম সরকারের কালে, "গেরোনশন্" হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতায় উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।

তাছাড়া, এই প্রভাব বা তুল্যমানসের প্রসার আজও চলছে। আজই হয়তো সে প্রসারের সীমা স্পষ্ট—বুদ্ধদেব বসুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক বন্ধুরাও আজকাল বলছেন পরিশ্রমী ও আত্ম-সচেতন কাব্যসাধনার কথা এবং ওদিকে ইতিমধ্যে কমলবন পরিক্রান্ত আর গোলাপের রহস্য আমরা নিঃশেষ করে ফেলেছি। আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্বেদাক্ত প্রত্যক্ষবাদের।

এলিঅট-কে তাই আমরা আজ প্রকৃতই সাবালক শ্রদ্ধানিবেদন করতে পারি তাঁর ষাটবছরের জন্মদিনে, ভিন্‌গাঁয়ের ভিন্নধর্মী খুড়ো মেসোর মতো॥

১৯৪৭

এলিঅটের কবিতা

য়ো দোশিজা যো রোঙ্গ

কিমিতি ত্বামহং স্মরামি কণ্ঠকে

দাঁড়াও সিঁড়ির সব উঁচু পইঠায়
কুসুমবেদীর গায়ে হেলান দাও—
সূর্যালোক বোনো বোনো তোমায় চুলের ছায়ায়—
ফুলগুলি তোমার জাপটে ধরো সকরুণ বিস্ময়ে—
ছুঁড়ে দাও মাটিতে আর ফিরে তাকাও
উড়ন্ত বিরাগ এক তোমার চোখের আশ্রয়ে :
তবু বোনো সূর্যালোক বোনো তোমার চুলের ছায়ায়।

এই ভাবে ছেলেটি নিক না বিদায়,
এই ভাবে মেয়েটি দাঁড়াক পাণ্ডুর ব্যথায়
এ ভাবেই বিদায় সে নিত
ছিন্ন ক্ষত দেহ ছেড়ে আত্মার মতন,
ব্যবহারে জীর্ণ দেহ ছেড়ে যেন মন।
আমি খুঁজি
এমন এক উপায় যা পেলব দক্ষতায় তুলনারহিত
এমন এক কায়দা যা বুঝবে উভয়েই
সহাস্য নমস্কারের মতো যা সরল, যাতে কোনো অঙ্গীকার নেই

তন্বী তো ফিরাল মুখ, কিন্তু হেমন্ত হাওয়ায়
আমার কল্পনা তার মুঠিতে বাঁধা বহুদিন ধরে
বহু দিন বহু দণ্ডপল :
চুল তার দুই বাহু বেয়ে, ফুলে ফুলে দুবাহু উচ্ছল।
ভাবি শুধু মানাত কেমন জানি যদি মিলত দোঁহায়,
আমিই পেতুম নাকো ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা এক নেতির মুদ্রায়—
থেকে থেকে এই সব ধ্যানধারণায়
অস্থির দুপুর রাত্রি মধ্যাহ্নবিশ্রাম দেখি আজও শিহরে ॥

জরায়ণ

এই তো রয়েছি এক বুড়ো, ভিজে ভাদুরে বাদলে,
নাতি প'ড়ে খবর শোনায়, রৌদ্রের আশায়।
আশ্রমে আমি তো কোনো খাদির খামারে হাঁকিনিকো দর,
লড়িনি পশ্চিমা রৌদ্রে,
কিম্বা চেনাবের স্রোতে, উঁচিয়ে কৃপাণ
রক্তচোষা মাছির ভনভনে।
আমার এ বাসাখানি পড়ন্ত ঘর যে,
ওদিকে মালিক ব'সে জানালার কিনারে ঐ মারবারী,
জন্ম তার বনারসে ঘাটের কাদায় কোন্,
কানপুরে তেতেছে সে, মেতেছে সে কলকাতায়।
ছাগলটা কাশে রাতে, মাথার ওপর মাঠে।
পাথর, শেওলা, আর কণ্টিকারী, লোহা আর কাঁটা তার।
স্ত্রীলোকটি রাঁধে বাড়ে, চা বানায়
সন্ধ্যায় হাঁচতে লাগে আড়বুঝো নালাটায় খোঁচা দিতে দিতে।
আমি এক বুড়ো-হুড়ো লোক,
মোটা মাথা, বাদলার হাওয়ায়।

আবির্ভাব শেষটা দাঁড়ায় আশ্চর্য ঘটনা।
আমরা সবাই চাই আবির্ভাব।

দর্শন, দর্শন, জন্মাষ্টমী।
শব্দের মাঝারে শব্দ, রুদ্ধবাক্‌, অপারগ শব্দ উচ্চারিতে
কাংস্য অন্ধকারে কাঁথায় জড়ানো ; স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ্‌গমে
এল কৃষ্ণ নরসিংহ
পাঞ্চজন্যে কেশরীহুঙ্কারে, বংশীরবে

পচা ভাদ্রে, কচুশাক, কালোজাম, মোহিনী ধুতুরা
চর্ব্য, চোষ্য, বিভাজ্য ও পেয়
গোপন ফিসফাসে, তাই জোটে হাতিলাল মেহতা
কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা
পায়চারি করেছিল সারা রাত পাশের কামরায় ;
জোটে তাই কালচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়ারি ঝাড়ের তলায় ;
মুখুয্যে গৃহিণী জোটে অন্ধকার ঘরে
বাতি নাড়ে আগে পরে পরে আর আগে ; জোটে
মিষ্টার তরফদার বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে ; একহাত দ্বারে।
শূন্য চরকাগুলি
হাওয়া বোনে পাকে পাকে শূন্য হাওয়ায়।
আমার তো দল নেই ভূতপ্রেতহীন
একা বুড়ো লোক, ফুটো ফাটা ঘরে
ঝোড়ো দরজায়।

এ প্রজ্ঞার পরে কিবা ক্ষমা ? ভাবো আজ
ইতিহাসে আছে কতো চতুর দালান, কতো সুড়ঙ্গ নিপুণ
কতো নিষ্কাশন ; ইতিহাস প্রবঞ্চক উচ্চাশার চক্রান্ত গুঞ্জনে,
দম্ভের ছলায় করে নিয়ন্ত্রণ আমাদের। ভাবো আজ
তার দান আসে যবে আমরা অমনোযোগে হাত্ত পাতি নাকো
ক্ষমতার অন্ধকারে চাকরির নেশায়। আর তার দান যা সে দেয়,
দেয় এমনি ওস্তাদ মেশালিতে যে সে দামে অশনায়া হয় ক্ষুরধার।
দেয় অতি বিলম্বেই
যখন নেইকো আস্থা কিছুতেই কিম্বা যদি থাকেই আস্থা
সে শুধু স্মৃতির, রোমন্থ-আবেগ। কখনও বা দেয় বেশি আগে
দুর্বল হাতের মাঝে, মনের প্রস্তুতি বিবেচনা বাদ দিয়ে রেখে
যতোক্ষণ অস্বীকারে সংশয় না জেগে ওঠে : ভাবো
ভয়ে কিম্বা দুঃসাহসে মুক্তি নেই আমাদের। আমাদের
বীরত্বে জন্মায় জঘন্য পাপের গ্লানি। ধর্মনীতি
আমাদের ঘাড়ে ওঠে আমাদেরই দুর্বৃত্তির চাপে।
এই অশ্রুধারা অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ থেকে ঝরে।

আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিই নি, আর আমি
দড়া হই ভাড়াটিয়া ঘরে। ভাবো একবার
আমি তো দেখাইনি এই খেল্ বিনা অভিপ্রায়ে
দেখাইনি জেনো কোনো পিছু-হাঁটা
শয়তানের দলের শমনে।
একথা বলবো আমি তোমাদের পূর্ণ-সততায়,
যে আমি তোমার হৃদয়ের পাশ থেকে তাড়িত সুদূরে

ভয়ে আজ সুন্দরকে দেখি ধরাশায়ী,
ভয়ও দেখি পদলেহী দুঃশাসন তাড়নার জালে।
আমার আবেগ গত, কেন আর ধরে রাখি তাকে
যেহেতু যা রাখি তাও ভেজাল প্রতিষ্ঠা ?
আমার গিয়েছে চোখ, ঘ্রাণ, কান, স্বাদ, স্পর্শ সব
কেমনে তুমিই বলো জীয়াই তোমার সান্নিধ্যের আশে ?
এই সব হাজার চিন্তারা শীতল জরিষ্ণু প্রলাপের
পাওনা বাড়ায় নিজেদের, বিলম্বিত করে লালবাতি,
ইন্দ্রিয় মৃত যে সেটা মানে নাকো, ত্বকে তাই
লাগায় মলম, উত্তেজনা চায় মদিরা মোদকে, শতেক দর্পণে
শূন্যকে জাগায় স্ফীত পুনরাবৃত্তিতে। মাকড়সা কি তার
কাজ বন্ধ ক'রে দেবে অলিতে গলিতে, টিকটিকি কি
থেমে যাবে চৌমাথায় ? রামসিং, রহমৎ, শ্রীমতী কৌয়া
উধাও উড়ন্ত ঐ বাতাসের চক্রে চক্রে থরথর পামীরের পাকে পাকে
ঘূর্ণমান শতদীর্ণ অণু। মৌসুমীর ঝাপটায় শকুনির
পাখসাট, কলকাতায়, বঙ্গোপসাগরে, পাহাড়তলীর বানে,
শাদা জলে ডুবে যায় কালোপাখা শকুনির পাল,
বাংলার বৃষ্টি চায় আমাকেও
আমি এক বুড়ো লোক পূবালী হাওয়ায়
ঘুমন্ত কোণায় বসে ঝিমাই একলা।

ঘরে ঘরে ভাড়াটেরা
এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায় চিন্তারা
আমারও হৃদয়।

ফাঁপা মানুষ

বুড়ো মোড়লকে কানাকড়ি

১

আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস দিয়ে এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে ! হায়রে !
যখন ফিসফিসিয়ে আলাপ করি
আমাদের শুকনো গলা শোনায়
চাপা অর্থহীন
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিম্বা যেন আমাদের সরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা

রূপহীন কিমাকার, বর্ণবিহীন ছায়া,
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গী নিশ্চল ;

যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে—যদি রাখে
মনে রাখে শুধু
ফাঁপা মানুষ
ফাঁকা মানুষ ব'লে।

২

স্বপ্নেও সে চোখগুলির চোখোচোখি সয় নাকো।
মরণের স্বপ্ন অলকায়
তারা আসে নাকো :
সেখানে সে চোখগুলি নিষ্পলক জাগে
খর রৌদ্র যেন ভাঙা মর্মরের স্তম্ভের গায়ে
সেখানে একটা গাছ অবিশ্রাম দোলে
আর কণ্ঠস্বরগুলি মনে হয়
বাতাসের করতালে খোলে
নিভন্ত নক্ষত্রের চেয়ে
আরো দূর আর আরো গম্ভীর-তন্ময়।

চাই না আর যেন যাই না আরো কাছে
মরণের স্বপ্নঅলকায়
আমিও যেন পরতে পাই বেছে বেছে
ছদ্মবেশ
ইঁদুরের জামেআর, পরচুলা কাকের পালক
কাকতাড়ুয়ার লাঠি আড়াআড়ি হাতে
পোড়ো ক্ষেতে
কাজ—যা করায় হাওয়াতে—
আরো কাছে নয়

সে চরম সম্মিলন নয়
সন্ধ্যা অলকায়।

৩

এই তো শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ
পাষাণের মূর্তিগুলি
এখানে স্থাপিত এই, এখানে তারা পায়
মৃতের হাতের কাতর মিনতি
নিভন্ত নক্ষত্রের জ্বলে ওঠায়।

সে কি এমনিতর
মরণের সেই অলকায়
সঙ্গীহীন জেগে উঠে
যখন মাধুর্যে বিধুর কাঁপি থরথর
ওষ্ঠাধর চুম্বনে উদ্যত
আচম্বিতে ভাষা পায় প্রার্থনায় ভাঙা পাষাণের পায়ে লুটে।

৪

এখানে সে চোখগুলি নেই
কোনো চোখই নেই
এই ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের উপত্যকায়
এই শূন্য উপত্যকায়
আমাদের এই ভ্রষ্ট রাজ্যের ভগ্ন জঙ্ঘা-জানুতে

সম্মিলনের এই শেষ মেলায়
আমরা সব হাৎড়ে হাৎড়ে মরি
আর আলাপের মুখ চেপে ধরি
জড়ো হয়েছি সবাই
শোথস্ফীত এ নদীর বালুকা বেলায়

দৃষ্টিহীন, যদি না
সেই চোখগুলি আবার আসে
ধ্রুবতারা যেন আকাশে
শতদল স্বর্ণকমল
মরণের সন্ধ্যা অলকায়
ফাঁকা মানুষের
একটি মাত্র আশা।

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
কাঁকড়ার দল চলে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
মাকড়সা দেয়ালে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চিম্‌সে পাখা
চামচিকেরা মেলে
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয়
ছেলেরা সব খেলে।

প্রত্যয় আর প্রত্যক্ষের মধ্যে
প্রবৃত্তি আর কার্যের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
ধারণ আর সৃষ্টির মধ্যে
আবেগ আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে
পড়ে কালছায়া
এ জীবন দীর্ঘ অফুরাণ

বাসনা আর তৃপ্তির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে
তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
প্রভু তোমারই
এ জীবন
প্রভু তোমারই তো এই

এই চালে ভাই ত্বনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই ত্বনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই ত্বনিয়ার শেষ
হাঁক দিয়ে নয়, কাৎরানিতেই ॥

লাফিয়ে উঠল হাওয়া

চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়
লাফিয়ে উঠল, ভাঙল ঘণ্টাঘড়ি
জন্ম-মরণে দোদুল্যমান হাওয়া।
হেথা, মরণের স্বপ্নরাজধানীতে
অন্ধ দ্বন্দ্বে জেগেছে প্রতিধ্বনি
একি স্বপ্ন কিম্বা অন্য কিছুই হবে
কালো নদীটার রূপে মনে হয় যবে
অশ্রুর ঘামে ভিজা সে কারো বা মুখ ?
দেখেছি সে কালো নদীর অপর পারে
ছাউনি আগুন নাচায় বর্শা কতো
হেথা মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যতো ॥

জীবকণা

'ঈশ্বরের হাত হতে বাহিরায় সরল হৃদয়'
অস্থির আতসে কোলাহলে বাঁধাধরা বিশ্বে আসে,
আলোকে আঁধারে আসে শুকনো ভিজা ঠাণ্ডা বা গরমে,
টেবিলে চেয়ারে চলে পায়ে পায়ে পায়ার আড়ালে,
কখনো বা ওঠে পড়ে, চেপে ধরে চুমা ও খেলেনা
নির্ভয়ে এগোয় এই, এই ভয়ে হঠাৎ কাতর
পালায় আশ্রয় খোঁজে বাহু আর কোলের কোণায়,
আগ্রহে আশ্বাস চায়, পূজার দালানে স্বরভিত
সমারোহে খুঁজে পায় সোজাসুজি আনন্দের স্বাদ,
আনন্দ বাতাসে পায়, রৌদ্রে পায় সমুদ্রের জলে ;
মেজেয় বীক্ষণ করে মনোযোগে রৌদ্রের নক্সা
রূপার রেকাবে দেখে নির্মিমেষে ছুটন্ত হরিণ ;
বাস্তব ও কল্পিতের বোঝে না সে কোনো ভেদাভেদ,
মহাখুশি তাস নিয়ে, রাজা আর রানীর খেলায়,
পরীরা কি করে ভেবে আর দাস দাসীরা কি বলে।
হৃদয় বয়স্ক হয় আর বোঝা হয় গুরুভার
বোঝায় বিমূঢ় করে নিপীড়িত ক'রে, দিনে দিনে ;
সপ্তাহে সপ্তাহে আরো নিপীড়ন আরো বিমূঢ়তা
'হয় আর মনে হয়'—এ দ্বন্দ্বের নানা প্রত্যাদেশে
উচিতে ও অনুচিতে, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়ম সংযমে।

বাঁচার যন্ত্রণা আর স্বপ্নের আফিমে জানালায়
কুঁকড়িয়ে বসে থাকে স্বল্পকায় বেচারি হৃদয়
মহাবিশ্বকোষ কিম্বা শব্দকল্পদ্রুমের আড়ালে।

সময়ের মুঠি থেকে বাহিরায় সরল হৃদয়
দুর্বল অস্থির স্বার্থপর খঞ্জ বিকল বিকৃত
এগিয়ে চলায় কিম্বা পশ্চাদ্‌গতিতে অপারগ
ভয় করে উষ্ণ সত্তা, প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ আহ্বান,
রক্তের পরোয়াহীন আবেগকে করে না স্বীকার,
নিজেরই ছায়ার ছায়া, নিজেরই বিষাদে ক্ষীণ-প্রেত
ধূলাকীর্ণ ঘরে রেখে যায় নথিপত্র এলোমেলো ;
প্রথম সে বাঁচে বুঝি অন্তিমের শেষ স্তব্ধতায়।

প্রার্থনা জানাও বেগ-শক্তিমত্ত গীতরিয়ের তরে
শতধারে চূর্ণ চূর্ণ বুত্থাঁরও প্রার্থনা
কপাল ফিরেছে যার তার
আর, যে গেল আপন পথে তারও তরে।
ধুতুরার ছায়াতলে বরাহকুকুরাহত ফ্লরের প্রার্থনা
প্রার্থনা তো আমাদেরও এখনই এবং আমাদের জন্মলগ্নক্ষণে

রাজর্ষিদের যাত্রা

আমাদের সে যাত্রা হিমে
বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়ে
অভিযান, ওরকম দীর্ঘ অভিযান :
পথঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া
দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম।
আর উটগুলি উত্যক্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ
থেকে থেকে শুয়ে পড়ে গলন্ত বরফে।
মাঝে মাঝে আমাদেরও আফশোষ হয়েছে
কোথায় গড়ানে সেই গ্রীষ্মাবাস, সেই হাওয়াখানা,
রেশমী মেয়েরা বয় সরবৎ পেয়ালা।
তারপরে উটের লোকেরা দিব্যি পাড়ে গজগজ করে,
পালায় চাহিদা তোলে মদ আর স্ত্রীলোকের,
আর নিভে যায় রাতের আগুন, আর আস্তানা জোটে না
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা,
গ্রামগুলি নোংরা, হাঁকে গলাকাটা দাম :
দুঃসময় গেল আমাদের।
শেষে তাই আমরা চললুম সারারাত, না থেমেই
টুকরো টুকরো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

তারপরে ভোরবেলা এলুম কবোষ্ণ উপত্যকায়,
সোঁদা সোঁদা, তুষাররেখার নিচে, আবাদের গন্ধ ভাসে,
খরস্রোত নদী এক আর এক জলযন্ত্র আঁধারকে মারে
আর তিনটি গাছ খাটো আকাশের গায়ে
আর একটা শাদা ঘোড়া মাঠে ছুটে যায়।

তারপরে পৌঁছলুম এক সরাইখানায়, চৌকাঠ আঙুরলতায় ঢাকা,
খোলা দরজার মুখে ছটা হাত রূপোর টুক্‌রোর লোভে পাশা খেলে,
আর লাথি ছোঁড়ে খালি মদের মশকে।
কিন্তু সংবাদ মিলল না কিছু, আবার চললুম
পৌঁছলুম শেষটা সন্ধ্যায়, লগ্নের এক পলক আগে নয়
সেই স্থান খুঁজে পেয়ে, (বলতে পারো) স্বস্তিকর বটে।

এ সব ঘটেছে বহুকাল আগে, মনে পড়ে
আবার ঘটুক এই চাই—কিন্তু লেখো
এই লিখে রাখো
এই : এতোখানি পথ চালিত হলুম আমরা যে
সেকি জন্ম না মরণের তীর্থে ? জন্ম হয়েছিল এক, নিশ্চিত তা,
প্রমাণ পেয়েছি, নেই কোনোই সংশয়। আমি তো দেখেছি দুইই জন্ম ও মরণ,

আমার ধারণা ছিল ও দুটি স্বতন্ত্র ; এই জন্ম এল
আমাদের ক্ষুরধার কঠিন যন্ত্রণা, মরণের মতো, আমাদের আপন মরণ।
আমরা এলুম ফিরে যে যার মুল্লুকে, যে যার রাজত্বে,
কিন্তু আর স্বস্তি নেই এখানে এ প্রাচীন বিধানে
বিধর্মী লোকেরা সব তাদের দেবতা আঁকড়িয়ে।
খুশি হব আরেক মরণে।

সিমেঅনের গান

প্রভু ! আজ রোমান হায়াসিন্থ্ টবে ফুটছে, আর
শীতের সূর্য চুপি চুপি লতিয়ে উঠছে তুষার পর্বতে
অবাধ্য ঋতু বাসা বাঁধছে তার।
আমার জীবন চলে লঘু আজ সময়ের পথে
মরণ বাতাসের জন্যে প্রতীক্ষমান জীবন আমার
হাতের পিছনে পালকটার মতো।
রৌদ্রালোকে ধূলিকণা, কোণে কোণে অতীতের স্মৃতি
মৃত্যুর তুহিনদেশে নিয়ে যায় যে বাতাস, তার
প্রতীক্ষায় রয়েছে আহত।

তোমার শান্তি আমাদের দাও।
এ নগরে বহুকাল ঘুরেছি তো আমি
অক্ষুণ্ণ রেখেছি আমার ব্রত, আমার ভক্তি
দরিদ্রের নিয়েছি ভার
দিয়েছি সম্মান-স্বস্তি যথাযোগ্য, পেয়েছিও নিজে।
আমার দ্বার থেকে কেউ ফিরে যায় নি হতাশায়
তবু প্রশ্ন প্রাণে
আমার বাড়িটি—কে রাখবে মনে ?
দুঃখের সময় যখন আসবে এখানে
কোথায় পাবে বাসা সন্তানের সন্তান আমার ?
তাদের নিতে হবে গোচারণের পথ
তারা নেবে যতো শৃগালের বাসা সেইদিন
বিদেশী চোখের থেকে অনাত্মীয় হনন-উদ্যত
বিদেশীর তরবারি-রোষ থেকে আশাহীন
তারা সব পালাবে যখন
বেত্রাঘাত, শৃঙ্খল ও রোদনের সময়ের আগে

তোমার শান্তি আমাদের দাও।
পার্বত্য এ বিবিক্তির তীর্থক্ষেত্রে আজ
মাতার দুঃখের সেই অবশ্যসম্ভব সময়ের আগে
আজ এই মরণের প্রসব-প্রয়াগে
এই শিশুঅবতার তোমার বাণী অভাষিত, আজও ভাষাহীন
দিয়ে যাক্ ইস্‌রেয়লের আশ্বাস
দিয়ে যাক্ আমাকে, পুঁজি যার শুধু তার আশীবছর
ভবিষ্যৎহীন।

তোমারই বাক্যঅনুসারে, প্রভু।
তোমার তারা স্তব করবে আর
বংশে বংশে তারা বরণ করে নেবে
গৌরব আর অবজ্ঞায় সব অত্যাচার।
আলোর উপরে আলো, ওঠে পুণ্যবান সিদ্ধির সোপানে।
স্বধর্মসাধনে নিজের প্রাণদানে
ধারণার প্রার্থনার কঠিন পুলকে
চরম সে দিব্য আবির্ভাব—সে নয় আমাকে।
তোমার শান্তি আমাকে দাও।
(তোমার হৃদয় ভেদ করে যাবে তরবারি
তোমারো হৃদয়।)
আমার জীবনে আজ অবসাদ এসেছে, অবসাদ আমার
যারা আসবে পরে, তাদেরো জীবনে।
মরি আমি আজ মরণে আমার
যারা আসবে এখানে আমার পরে, তাদেরো মরণে।
দাসকে তোমার যেতে দাও, প্রভু!
যেতে দাও তোমার মুক্তি দেখে।

মারিনা

এ কোন্ স্থান, কোন্ রাজ্য, পৃথিবীর কোন্ দেশ ?

কতো না	সমুদ্র কোন্ বালুতীর ধূসরপাহাড় আর কোন্ সব দ্বীপ
কতো	জল ছল্‌ছল্ গলুই-এর গায়ে
আর	বেতসের গন্ধ আর বনদোয়েলের গান কুয়াশাকে চিরে
কতো	ছবি ফিরে আসে
হে	কন্যা আমার।

যারা	বসে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অর্থাৎ
মরণ	
যারা	শোভা পায় মনিয়াপাখির রংবাহারে, অর্থাৎ
মরণ	
যারা	সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ	
যারা	কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অর্থাৎ
মরণ	

তারা হয় অশরীরী, হাওয়ায় ক্ষয়িষ্ণু
বেতসের দীর্ঘশ্বাস, বন্যগানমুখর কুয়াশা
স্থানকালহীন একি মধুর লীলায়

এ কোন্ মুখ কার, অস্পষ্ট, স্পষ্টতর
হাতের ধমনীস্পন্দ লীন, বেগবান্—
এ কি দান না এ ঋণ ? নক্ষত্রের চেয়ে দূর, চোখের চেয়েও কাছে

কানে কানে কথা আর ছোট ছোট হাসি পাতা আর
ছুটন্ত পায়ের রেশে রেশে
ঘুমের গভীরে যেখানে সব জল মেশে।
চণ্ডিপাটে চিড় পড়ে বরফের চাপে, চড়া রোদে রং চটে যায়।
আমারই রচনা এ তো, ভুলে যাই
আর মনে পড়ে।
দড়াদড়ি ছেঁড়াখোঁড়া, চট্ পচে গেছে
একটি বৈশাখ আর আশ্বিনের মাঝে।
আমারই রচনা এ তো, না-জেনেই, আধো জেনে,
হে না-জানা, আমার আপন।
পাটাতন ফুটিফাটা, জলুই-তে পাটের দরকার।
এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন
আমাকে ছাড়িয়ে কোন্ কালের জগতে জীবনের তরে এ জীবন;
দিতে চাই আমার জীবন এনে মেনে দিই এ জীবনে,
আমার যতো কথা ঐ অকথিতে
এই জাগরিত, ঠোঁট দুটি ফুট্‌ফুটে, এই আশা,
এই সব নূতন জাহাজ।

কোন সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর কষ্টিপাথরের কতো দ্বীপ
আমার কাঠের দিকে আর
বনদোয়েলের ডাক কুয়াশাকে চিরে চিরে
কন্যা আমার॥

চড়কের গান (১)

যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার আর
যেহেতু রাখি না আশা
যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার
এর ইন্দ্রপ্রস্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা
সাধ্যের সাধনে সব করিনাকো সাধ
(বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা আর কেন উড়বে অবাধ ?)
কেন আমি শোচনার জের
মামুলি যুগান্ত টানি প্রত্যহ গতস্য শোচনার ?

যেহেতু রাখি না আশা জানবার আর
এ আস্তিক প্রহরের নশ্বর মহিমা
যেহেতু ভাবি না আমি আর দিবানিশা
যেহেতু জানব না আমি জানি কোনোদিন
একমাত্র সত্য তবু অস্থির সে ক্ষমতার সীমা
যেহেতু মেটে না তৃষা
আমার যেখানে ঐ গাছে গাছে ফুল ধরে, ঝর্ণার ধারা ঝরে, কারণ
কিছুই নেইকো আর

যেহেতু জেনেছি আমি কাল সদাসর্বদাই কাল
স্থান শুধু স্থান সর্বদাই
আর যা যথার্থ তার সে যাথার্থ্য টেকে শুধু এক কাল
শুধু এক স্থান
তাই তো আনন্দ করি এ জগৎ যা শুধু সে তাই
তাই সেই দিব্যমুখ করি প্রত্যাখ্যান

প্রত্যাখ্যান সেই ছন্দ তাই
যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার আর
যেহেতু আনন্দ করি, নির্মাণের অবকাশ পেয়ে
নির্মাণে আনন্দ তাই

এবং প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কৃপা চাই আমাদের তরে
এবং প্রার্থনা করি যেন ভুলে যাই
এ সব ভাবনা চিন্তা মনে মনে আলোচনা করি যা সর্বদা
কেবলি বোঝাই বারবার
যেহেতু রাখি না আশা ফেরবার আর
এই আমার সাফাই
যা ঘটেছে তার, যেন ঘটে না আবার
অন্তিম বিচার যেন গুরুভার হয়নাকো আমাদের পরে

যেহেতু এ পাখা আর পাখা নয় ওড়বারই
কিন্তু শুধু হাপরের হাওয়ায় প্রহার
যে হাওয়া এখন ক্ষীণ শুকনো একেবারে
ইচ্ছার চেয়ে ক্ষীণ, আরো স্নেহহীন

শেখাও মমতা মায়া, নির্মমতাও
শেখাও প্রতীক্ষা স্তব্ধ

প্রার্থনা জানাও পাপী আমাদের তরে আজ, আমাদের মরণপ্রহরে
প্রার্থনা এখনই আর আমাদের মরণ-প্রহরে।

চড়কের গান (৬)

যদিও রাখিনা আশা ফেরবার আর
যদিও রাখিনা আশা
যদিও রাখিনা আশা ফেরবার

লাভ ও ক্ষতির মধ্যে দোটানার পাকে
এই ক্ষণিকের মোড়ে স্বপ্নরা যেখানে মেশে বাঁকে
স্বপ্নে স্বপ্নে মেশা এই সন্ধ্যালোকে জন্ম ও মরার আহ্নিকে
(পিতা করো আশীর্বাদ) যদিও চাইনা আমি এইসব চাইতে আবার
ব্যাপ্ত বাতায়ন থেকে গ্রানিট্ সৈকতে
শুভ্রপাল উড়ে চলে সমুদ্রের দিকে উড়ে সমুদ্রের দিকে
অবিচ্ছিন্ন ডানা সারে সার

আর লুপ্ত চিত্ত অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে, নামে আনন্দবাসরে
লুপ্ত লাইলাকে আর লুপ্ত সমুদ্রের কণ্ঠস্বরে
এবং দুর্বল প্রাণ প্রাণ পায় চঞ্চল বিদ্রোহে
আনত স্বুবর্ণদণ্ড আর লুপ্ত সমুদ্রের গন্ধলুব্ধ মোহে
প্রাণ পায় চঞ্চল প্রত্যাশে
ঘুরন্ত চাতক আর দোয়েলের মুখর উল্লাসে।
আর অন্ধ দৃষ্টি হয় নির্মাণে নিয়ত
গজদন্ত তোরণের মাঝে রচে শূন্য রূপ যতো
আর ঘ্রাণে উজ্জীবিত বালুকাখচিত পৃথিবীর লবণ আস্বাদ।

এই তো আততি-কাল মরার ও জন্মের সেতুতে
নৈঃসঙ্গ্যের স্থান এই তিনটি স্বপ্নের তেমাথায়
নীল নীল পাহাড়ের মাঝে।
কিন্তু যখন যাবে ধুতুরা-ঝাঁকানো কণ্ঠগুলি সব ভেসে
অন্য ধুতুরার ডালে দিও টান ঝরুক উত্তর।

হে সন্ত ভগিনী, পুণ্য হে জননী, হে ঝর্ণার অধিষ্ঠাত্রী, হে উদ্যানদেবী
অসতো মা সদ্‌গময় মিথ্যায় করি না যেন আত্মপরিহাস
শেখাও মমতা মায়া, নির্মমতাও
শেখাও প্রতীক্ষা স্তব্ধ
এই সব পাহাড়েরই মাঝে
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য
আর এই পাহাড়েরই মাঝে
ভগিনী, জননী
এবং নদীর দেবী, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী,
বিচ্ছিন্ন কোরো না যেন আমাকে আবার

আমার ক্রন্দন পাক তোমার চরণ।

কোরিওলান

১। স্বাগত হে বীর

পাথর, পিতল, আর পাথর, ইস্পাত, পাথর, আমের পাতা,
ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর শানের উপরে।
এবং নিশান। আর তূর্য। আর কতো কপিধ্বজ।
কতো ? গুণে দেখ। আর কি লোকের ঠেলা।
সেদিন কঠিন ছিল চেনা নিজেদেরই, কিম্বা এ শহর।
এই মন্দিরের পথ, আমরা সবাই ভিড় করে পথে।
এতো লোক প্রতীক্ষায়, কতো লোক প্রতীক্ষায় ? কিবা আসে যায়, ও রকম দিনে ?
ওরা কি আসছে ? না তো ? শুধু কপিধ্বজ চোখে পড়ে। আর কানে আসে তূর্যনাদ।
এই তো আসছে ওরা। তিনি কি এলেন ?
আমাদের অহমের সহজ জাগ্রত ক্ষণ একপ্রকার বীক্ষণ।
আমরা প্রতীক্ষা করি চৌকি ও ফুলুরি নিয়ে বেশ।
কি আসছে আগে আগে ? চোখে পড়ে ? বলো নাহে। এ যে

৫ নিযুত ৮০ লক্ষ রাইফেল আর কারবাইন্
১ লক্ষ ২ হাজার মেশিন বন্দুক
২৮ হাজার পরিখা মর্টার
২৮ হাজার ফীল্ড ও হেভিগান্
জানিনা কতো যে হাত বোমা কতো মাইন্ ও ফিউজ্
১৩ হাজার এরোপ্লেন
২৪ হাজার এরোপ্লেন এঞ্জিন্
৫০ হাজার গোলাবারুদের গাড়ি
এবারে ৫৫ হাজার ফৌজী লরি
১১ হাজার ফীল্ড রান্নাঘর
১ হাজার ১ শো পঞ্চাশ ফীল্ড তাওয়াখানা।

কী দীর্ঘ সময় নিলে। এবারে কি তিনি বুঝি ? না তো,
ওরা সব ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন, ওরা সেবা-দল,
এবারে ওরা তো সব তুরঙ্কের কুস্তিসঙ্ঘ,
এবারে মেয়র আর কাউন্সিলাররা। দেখ
ঐ তিনি ঐ, দেখ :
কোনো প্রশ্ন নেই তাঁর চোখে
কিম্বা তুই হাতে, শান্ত হাত ঘোড়াটির ঘাড়ে।
আর চোখ তুটি সতর্ক, প্রতীক্ষমান, সজাগ, উদাস।
আহা সে গোপন কোন্ বলাকাপাখায়, গোপন সে সারসের বুকে,
মধ্যাহ্নে তমালতলে, যমুনার খরজলে
ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর স্থিরকেন্দ্রে। আহা হে গোপন।

এবারে সবাই মন্দিরের ধাপে ধাপে ওঠে। বুঝি হোমাগ্নি এবার।
এবারে কুমারীদল শুচিব্রত অর্ঘ্য আনে কলসে, কলসে
মাটি
মাটি
ছাই মাটি, এবারে এখন
পাথর, পিতল, আর পাথর, ইস্পাত, পাথর, আমের পাতা,
ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর শানের উপরে।
ঐ যা দেখেছি আমরা। কিন্তু কতো কপিধ্বজ! তূর্যনাদ খাসা!
(মহাষ্টমীর দিন, আমরা সেবার বাইরে যাইনি আর,
তাই তো গেলুম সব ছোকরা শিবুকে নিয়ে বারোয়ারিতলা। বাজল কাঁসর ঘণ্টা
এবং সরবে শিবু ব'লে উঠল, বাতাসা।) ফুলুরিটা ফেলো না হে,
কাজে লেগে যাবে। তিনি ওস্তাদ হে। মশায়, আলোটা ধরবেন একবার ?
আলো
আলো
ফৌজ ক্যা কিতার বন্দ্ রহি হ্যায় ?   বন্দ্ রহি জরুর।

কোরিওলান

২। কর্ণের খেদ

ক্রন্দন কিসের ক্রন্দন করব বলো ?
সর্বজীব নশ্বর নশ্বর
বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট, নবাব, সর্দার
আহা সে সর্দার ! নিজামৎ জং,
রানাশের জঙ্গের তারকা (সোনার, রূপার)
কাশ্মীরের কাকের পদক।
ক্রন্দন ক্রন্দন করব কিসের ক্রন্দন করব ?
প্রথম কাজই হল অনেক সমিতি গড়া :
পরামর্শ-পরিষদ, উপদেষ্টা-সমিতি ও বিশেষজ্ঞ এবং বহু শাখা সমিতি গঠন
একই সম্পাদকে হবে বহু সমিতির।
কিসের ক্রন্দন করি বলো ?
শ্রীশিবেন পাকড়াশী মাসিক পঞ্চান্ন টাকা মাহিনায়
বছরে বছরে দুটাকা মাহিনাবৃদ্ধি হারে আশি টাকা চরম হিসাবে
টেলিফোন অপারেটারের পদে বাহাল হলেন।
একটা সমিতি গড়ো, সে সমিতি জলসরবরাহের ব্যাপারে
এক এন্‌জেনিয়ার—কমিশন গড়ে দেবে।
কমিশন চাই এক চিরশান্তি ব্যবস্থার জন্যে
আফ্রিদি মিশনের সঙ্গে আলোচনা করে।

লাঠিয়াল, গুপ্তিছোরানির্মাতা ও কামারসঙ্ঘেরা
বায়না কমৃতি ব'লে এক আপত্তির যুক্তসমিতি করেছে
ইতিমধ্যে সান্ত্রীদল খালে বিলে পাশা খেলে
আর খালে বিলে ব্যাং ডাকে (শোনো দ্বৈপায়ণ !)
জোনাকিরা আলো জ্বালে ক্ষীণপাতে বিদ্যুৎবিলাস
কিসের ক্রন্দন করি বলো ?

জননী জননী
এই তো বংশের যতো মূর্তি সারে সারে, ধূলাকীর্ণ প্রতিমূর্তি
সবাই দেখতে এক, চন্দ্রবংশজাত,
সবাই দেখতে এক, আলো যেই জ্ব'লে ওঠে থেকে থেকে মশান-আলোয়
প্রহরীর হাতের মশালে হাইতোলার ফাঁকে ফাঁকে।
আহা হে গোপন···হে গোপন···যেখানে বলাকাপাখা সমাহিত
মুহূর্তের তরে রুদ্ধগতি
নিথর মুহূর্ত এক, মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম,
মধ্যাহ্নের বিরাট বটের কোনো চূড়ার শাখায় স্থির
বিকালের হালকা হাওয়ায় কাঁপা বুকের পালকতলে
সেখানে মন্দার খোলে পাখা তার, পারিজাত নত ঘরের চৌকাঠে
হে জননী (এ সব মূর্তির মধ্যে, যথাযথ নামাঙ্কিত, এর মধ্যে নয়)

আমি এক ক্লান্ত মাথা এসব মাথার মধ্যে
মোটা ঘাড়ে ভারি মাথা
বাতাসকাটারি নাক
জননী আমার
আমরা কি একদিন, এখনই হয়তো মিলতে পারি না দোঁহে
যদি ধৈর্য, সর্তত্যাগ, আত্মদান, পরস্পর অনুরোধ
এখন সবই মানে
আমরা কি পারি না মিলতে
হে গোপন
নিথর মধ্যাহ্নে, স্তব্ধ দাদুরীমুখর রাত্রিতে গোপন !
এসো এসো চামচিকের পাখার বিস্তারে,
এসো জোনাকির অগ্নিকণিকায়, ছারপোকার ক্ষিপ্রতায়
যতো সব ক্ষুদ্র জীব জন্মমৃত্যুস্বভাব, নশ্বর
ক্ষুদ্র জীব মাটির ধূলায় মিহি গান করে রাত্রির গভীরে।
হে জননী
আমরা সমিতি চাই, সর্বজন প্রতিনিধিমূলক সমিতি, তদন্ত-সমিতি
পদত্যাগ পদত্যাগ পদত্যাগ

নিসর্গ দৃশ্য

নিউহ্যাম্পশিয়র

বউলের মাস আর ফলের মাসের মাঝে
শিশুদের গলা ঐ আম জাম বনে :
সোনা মুখ, রাঙা মুখ
সবুজ ডগার আর শিকড়ের মাঝে।
কালো পাখা, মেটে পাখা, দাও ছায়া দাও ;
বিশটি বছর, আর, বসন্ত উধাও ;
আজ কাঁদে, কাল কাঁদে হায় ;
ঢাকো ঢাকো, পল্লবিত আলোক ! আমায় ;
সোনা মুখ, কালো পাখা, ধাও
জড়াও, দোলাও, লাফ দাও, গাও
দুলে দুলে উঠে যাও জামরুলের ডালে।

ভার্জিনিয়া

লাল নদী, লাল নদী,
মন্থর স্রোত তাপ তো নীরব,
কোনো ইচ্ছাই নিথর নয়কো নিথর নদীর মতো
তাপের স্তম্ভ নড়ে কি একটিবার
বউ কথা কও বারেক ডাকায় ? স্তব্ধ পাহাড়
প্রতীক্ষমান। ফটকে তোরণে প্রতীক্ষমান। বেগ্‌নি গাছেরা
শাদা গাছগুলো প্রতীক্ষমান
দেরি কতো সয়, শতদিকে ক্ষয়। জীয়ন্ত প্রাণ
জীবন্ত প্রাণ কঠিন অচল। সদাই সচল
লৌহ ভাবনা—এসেছিল তারা আমারই সঙ্গে
আমারই সঙ্গে বিদায়রঙ্গে যায় :
ওগো লাল নদী ওগো নদী লাল নদী।

অসক্‌

ভেঙোনা হঠাৎ ডাল অথবা কোরোনা আশা
শাদা হরিণেরে শাদা কুয়ার আড়ালে।
ফিরাও নয়ন, খর তীর নয়, মন্ত্রজালে
অতীত কুহক আর জাগিও না। ঘুমাক্‌ ঘুমাক্‌ নতশিরে।
নামাও যতনে ধীরে, কিন্তু নয় অতল গভীরে।
তোলো চোখ দুটি
যেখানে সড়ক নামে এবং যেখানে সড়ক গিয়েছে উঠে
যেখানে ধূসর আলো মিশে যায় সবুজ হাওয়ায়
মুনির মন্দিরে, পরিব্রাজকের প্রার্থনায়।

র‍্যানথ্‌ বাই গ্লেন্‌কো

এখানে উপোসী কাক, এখানে সহিষ্ণু মৃগ পাতে তার
সংসার বন্দুকেরই তরে। টস্‌টসে আকাশ আর
থস্‌থসে জলার মাঝে, কদাচিৎ স্থান
লক্ষ্যের বা ওড়বার। বস্তু ঝরে ঝুর্‌ঝুর্‌ শীর্ণ হাওয়ায়
শীতল চাঁদের কিম্বা উষ্ণ চাঁদিনীর। পথ চলে ঘুরে ঘুরে
প্রাচীন যুদ্ধের অবসাদে
চলে ভগ্ন ইস্পাতের বিলগ্ন ক্লান্তিতে।
হতবুদ্ধি অন্যায়ের আর্তনাদে, শোভন সে
শুধু স্তব্ধতায়। স্মৃতি শক্তিধর, হাতেরও নাগাল
সে ছাড়িয়ে যায়। গর্ব ভাঙে মট্‌মট্‌
তবু ছায়া লম্বিত গর্বের, দীর্ঘলম্বে নেই
হাড়ে হাড়ে সংঘর্ষে মিলন।

কেপ অ্যান্

আহা ! চট্‌পট্ চট্‌পট্ শোনো ঐ গানচড়াই
বিলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই
সকালে বিকালে। নাচ দেখ চেয়ে নাচ দেখ ধেয়ে
ভর্-দুপুর হরিয়ালের। ছেড়ে দাও তার খামকাখুশিতে
পাপিয়া-কে, বাছা বড়ো লাজুক। ডেকে আনো ঘরে
দোয়েলের সুরে ধারালো শিসে কাদাখোঁচাকে
খাগড়া-ঝোপে যে এড়িয়ে বেড়ায়। ধাওয়া করো ঐ
পায়দলচল ডাহুক-কে। ধাওয়া করো ও-ফিঙের
তীরের নাচনে ছুটে ধাওয়া। কর মৌনে বরণ
বাদুড় বীরকে। সবই দিল্‌খুশা। মধুর মধুর
তবু ছাড়ো দাবি, ছেড়ে দাও জমি শেষে
জমির মালিক হিম্মৎ-ওয়ালা গাংচিলকেই।
আবোল তাবোল শেষ।

বরন্ট্ নরটন্

যদিচ সর্বজীবেই শব্দব্রহ্ম,
তত্রাচ মানুষের আচরণে প্রতীত হয় যেন
প্রত্যেকেরই ভিন্ন বুদ্ধি
আরোহণ ও অবরোহণ অনন্য পন্থা।—হেরাক্লাইটস্

১

বর্তমান কাল আর গতকাল উভয়ে বুঝিবা
বর্তমান ভাবীকালে
আর ভাবীকাল ভাব্য অতীত জঠরে।
যদি সর্বকাল থাকে চিরকালই বর্তমান
অমোচ্য সে সর্বকাল শূন্য আশাহীন।
যা হতে পারত সে তো তত্ত্বমাত্র
সদাসর্বদাই চিন্তার কল্পনাবিশ্বে
শুধু চিরন্তন সম্ভাবনা।
যা হতে পারত আর যা সত্যই হল
দুয়েরই নির্দেশ এক, এক লক্ষ্যে, সদা বর্তমানে।
পদক্ষেপ ওঠে প্রতিধ্বনিত স্মৃতিতে,
যে দালানে যাইনি আমরা
দুয়ারের দিকে, যে দুয়ার খুলিনি কোনোদিন
গোলাপ বাগানে যেতে, সেই পথে। আমার কথার প্রতিধ্বনি
এই ভাবে, তোমার হৃদয়ে।
কিন্তু সে যে কি উদ্দেশ্যে
গোলাপ-দানিতে ঝরা পাতার ধূলায় ঝড় তুলে;
আমি তা জানি না।

বাগানে বাসিন্দা। আমরা করব কি ধাওয়া ?
শিগগির, পাখিটা বলে, খোঁজো, খোঁজো, ওরা
বাঁকটা ছাড়িয়ে কোথা। প্রথম ফটক পার হয়ে
আমাদের প্রথম জগতে, আমরা কি করব ধাওয়া
দোয়েলের বঞ্চনাই ? আমাদের প্রথম জগতে—
সেখানে তারা তো ছিল, স্বাধীন, অদৃশ্য সব
স্বতই চলিষ্ণু ছিল মরা ঝরা পাতার উপরে
শরতের মৃদুতাপে স্পন্দমান বাতাসের স্রোতে,
তখন ডাকল পাখি, কুঞ্জের গোপন
অশ্রুত সে গানের উত্তরে,
অদৃশ্য দৃষ্টির রশ্মি পার হয়ে, কারণ গোলাপগুলির চেহারায় বোঝা যায়
তারা সব চোখে-পড়া ফুল।
সেখানে অতিথি তারা আমাদেরই, গৃহীত, গ্রহীতা।
এভাবে আমরা চলি, আর ওরা, জ্যামিতিবিন্যাসে,
শূন্য গলিপথ দিয়ে, বেড়ার গোলকে,
সেঁচা দীঘি ঝুঁকে পড়ে দেখতে চলেছি।
শূন্য দীঘি, শুকনো শান, পাটল পাড়ের রেখা,
আর, দীঘি পূর্ণ হল জলে জলে রৌদ্রে থৈ থৈ,
আর, পদ্ম মাথা তোলে, ধীরে, অতি ধীরে,
আলোর অন্তর থেকে প্রদীপ্ত বাহির,
আর ওরা আমাদের পিছনে, দীঘিতে মুকুরিত।
তারপরে একফালি মেঘ গেল, শূন্য হল দীঘি।
যাও, পাখি বললে, কারণ পল্লবে পল্লবে শিশুদের মেলা,
মহা শোরগোল, কেবা কোথায় লুকিয়ে, সম্ভাব্য হাসিতে।

যাও যাও যাও, পাখি বললে, মানুষে
সইতে পারে না বেশি বাস্তব সত্তা-কে।
গতকাল আর ভাবীকাল
যা হতে পারত আর যা সত্যই হল
নির্দেশ করে সে একই লক্ষ্যে, এক সদা বর্তমানে।

২

রসুন ও ইন্দ্রনীল কাদায় কাদায়
মাটিতে জমেছে রথচক্রের ধুবায়
অনারোগ্য ক্ষতচ্ছায়ে রক্তের ধারায়
মুখর সংগীত স্পন্দমান তারে তারে
বিস্মৃত যুদ্ধের দ্বন্দ্ব মেলায় এবারে।
শিরায় শিরায় নৃত্য, গ্রন্থিসার ধেয়ে
সঞ্চালিত স্রোত বুঝি প্রতিভাস পায়
নীহারিকাপুঞ্জে ক্ষিপ্র নক্ষত্রের সারে
চৈত্রে ওঠে বটে ওঠে আমজাম বেয়ে
আমরাও চলি ঊর্ধ্বে গাছের ধাওয়ায়
আলোয় আলোয় চিত্রবিচিত্র পাতায়
আর শুনি নিচে কাদা মাটির উপরে
শিকারী কুকুর আর দস্তুর শূকরে
আপন বিন্যাসে পিছু ধায় পরস্পরে
অথচ শান্তিতে মেলে নক্ষত্রের সারে।

ঘূর্ণ্যমান এ বিশ্বের স্থির কেন্দ্রে। দেহ নয়, দেহাতীতও নয় ;
কোথাও থেকেও নয়, কোথাও গম্যও নয় ; স্থিরকেন্দ্রে, নৃত্য সেখানেই,
কিন্তু নয় সম্বরণ, আন্দোলনও নয় এবং বোলো না সেটা নিশ্চল নিয়ম।
যেখানে গত ও ভাবী সংগৃহীত। কোথাও থেকেও নয়, গম্যও কোথাও নেই,
আরোহণ নয় কিম্বা অবতরণও সে নয়।
আদ্যন্ত সে কেন্দ্র ছাড়া, সেই স্থিরকেন্দ্র ছাড়া
নৃত্য কিছু নেই আর কেবল নৃত্যই তৎসৎ।
এটুকু বলতে পারি আমি, সেইখানে আমরা ছিলুম, কিন্তু বলা যায়না কোথায়
বলতে পারি না আমি, কতোক্ষণ, সে যে হবে কালে তাকে স্থানান্তর।
প্রত্যক্ষ চিকীর্ষা থেকে অন্তরের স্বাধীনতা
কর্ম ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, ভিতরের আর
বাহিরের চাপ থেকে ছাড়া পাওয়া, অথচ রইবে ঘিরে
ইন্দ্রিয়প্রসাদ এক, এক শুভ্র জ্যোতি স্থির অথচ সচল,
আবেগ অথচ কোনো ঈপ্সা নেই, একান্ত সংহতি, তবু
কিছুই সংক্ষেপ নয়, একাধারে নতুন জগৎ
এবং পুরানো, স্পষ্ট, উভয়েই উপলব্ধ
নিজের নিজের খণ্ডিত পুলকগণ্ডী সম্পূর্ণ হওয়ায়,
নিজের খণ্ডিত ভীতি সমাহিত ব'লে।
গত ও ভবিষ্য তবু যদি শৃঙ্খলিত হয়
পরিবর্তনীয় এই শরীরের দুর্বলতা ডোরে,
তবেই মানুষ বাঁচে মর্ত্যের অসহ
স্বর্গ ও নরক থেকে।

কাল গত আর কাল ভাবী

আমাদের মুষ্টিভিক্ষা চেতনা জোগায়।
চেতনা মানেই সে তো কালের অতীত

অথচ কালেরই পটে গোলাপ বাগানে সেই মুহূর্ত একটি
লতাকুঞ্জে বৃষ্টিউদ্বেজিত মুহূর্তটি
ধোঁয়ার প্রহরে সেই মুহূর্তটি ঝোড়ো মন্দিরের
স্মরণে অস্তিত্ব পায় ; গত আর ভাবীতে জড়িত।
কালেরই মাঝারে শুধু কালীয়-দমন।

৩

এই তো সে বিরাগের ঠাঁই
গতকাল আর ভাবীকাল
অস্ফুট আলোয় : দিবালোক নয়
স্বচ্ছ স্থিরতায় রূপের আরোপে
ছায়াকে যে কায়া দেয় ক্ষণিক সুন্দরে
মন্থর আবর্তে এনে অক্ষয় আভাস,
অন্ধকারও নয়, এ তো চিত্তশুদ্ধি ব্রতে
পঞ্চেন্দ্রিয় শূন্য ক'রে কৃচ্ছ্রে বিবিক্তিতে
অনুরাগ মুক্তিস্নাত মুক্ত কালোত্থিত।
ঋদ্ধি নয় রিক্ততাও নয়। শুধুই নিমেষপাত
কালাহত বিড়ম্বিত মুখের উপরে সব,
খেয়ালে খেয়াল থেকে খামকাতাড়িত
নানান খুশিতে ঠাসা আর অর্থহীন
অনীহাতে স্ফীত, নেই কোনোই সংহতি
নানা মানুষের ভিড়, কাগজের টুক্‌রো ওড়ে শীতল বাতাসে
কালের আগে ও পরে বইছে বাতাস
অসুস্থ ফুসফুস থেকে যায় আর আসে
কালের বাতাসে কাল আগে আর পরে।

কলকাতার নিরানন্দ খালে বিলে সেঁচা
বিলীন হাওয়ায় যতো স্বাস্থ্যহীন আত্মাদের
আকণ্ঠ উদ্গার, যতো ভারাক্রান্ত জড়
জড়ো হয় বাতাসের লগির ঠেলায়
বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা, মাণিকতলা,
কাশীপুর, দমদম, বরাহনগর। এখানে সে নয়
নয় সে এখানে সেই অন্ধকার কিচিমিচি এ জগতে নয়।
আরো নিচে নামো, নামো
শুধু চিরন্তন নিঃসঙ্গের তিমির জগতে,
জগৎ জগৎই নয়, সে জগৎ অপ্রাকৃত
আন্তরিক অন্ধকার, সকল সত্ত্বের
বিবিক্তি, দুস্থতা
ইন্দ্রিয়সংবেদ্য বিশ্বে অবক্ষয়
কল্পনাবিশ্বের সে যে বাস্তুছাড়া নীতি
মানসবিশ্বের সে যে অসহায় পক্ষাঘাত ;
এ একটি পথ এবং অন্যটি সেও
একই, সে গতিতে কিম্বা আন্দোলনে নয়,
সেও তো স্তম্ভিত গতি ; এদিকে জগৎ চলে
বাসনার দীর্ঘশ্বাসে, জগতের সরকারী রাস্তায়
গতকাল ও ভাবীকালের।

৪

কাল ও ঘণ্টা দিলে দিনের কবর
কালো মেঘ নিয়ে গেল সূর্যকে প্রখর।

সূর্যমুখী চাইবে কি আমাদের পানে, মেলবে মালতীলতা
আমাদের দিকে হেলবে কি ? আঁকশি ও ফুলঝাড় পরস্পর
জড়াবে পাকাবে ?
হিমানীর
শ্মশানধুতুরা বুঝি আঙুল বাঁকাবে
আমাদের দিকে ? মাছরাঙার পাখায় যবে
আলো পাবে আলোর দোহার তারপরে স্তব্ধ রবে
তখনও তো আলোর বিন্দুটি ঘূর্ণ্যমান জগতের স্থির কেন্দ্রে স্থির

৫

শব্দেরা চলিষ্ণু, সুরও চলে শুধু
কালে কালক্ষেপে ; কিন্তু যা কিছু জীয়ন্ত
সে শুধুই মরে। শব্দেরা কথার শেষে
পৌঁছায় নৈঃশব্দ্যে। শুধু রূপায়ণে, নকশায়, বিন্যাসে
শব্দেরা অথবা সুর খুঁজে পায় সে স্থিরতা
যেই স্থিরতায় আজো চৈনিক কলস স্থির
অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে নাচে।
সারেঙ্গীর স্থিরতা নয়কো, চরম পর্দায় শেষ স্বর,
শুধু সেইটুকু নয়, কিন্তু সহজীব্যতা সে,
কিম্বা বলো, অন্ত আসে আদির আগেই
এবং সে আদি-অন্ত সদাই বিরাজে
আদির আগেই আর অন্তের পরেও।
এবং সমগ্র সর্বদাই সাম্প্রতিক। শব্দে টান পড়ে,
চিড়্ খায়, কখনও বা ভেঙে পড়ে, চাপে,

আততিতে, ফস্‌কায়, পিছলায়, নষ্ট হয়ে যায়,
অযাথার্থ্যে ক্ষয়ে যায়, যথাযথ খাপ খায় নাকো,
থাকে নাকো স্থির ! বেতালার গলা যতো
ধমকে, ঠাট্টায়, কিম্বা নিছক বকবকে
শব্দদের অবিরত আক্রমণ করে। লুব্ধ মদনের গলাবাজি
কৈলাসের বাক করে প্রায়ই কলুষিত,
শবশোভাযাত্রী নৃত্যে রুদ্ধমান ছায়া
স্বর্ণমারীচের দিশাহারা হাহাকার।
রূপের বিন্যাসে অংশ শুধু গতির বিস্তার
যেমন প্রমাণ দশটি সিঁড়ির উপমা,
বাসনা স্বতই গতি
যদিও স্বতই কাম্য নয়,
প্রেম নিজে স্বভাবত গতিহীন
শুধুই গতির কারণ ও পরিণতি,
কালাতীত, কামগন্ধহীন
এক কালের দৃষ্টিতে ছাড়া,
সীমারূপে বদ্ধ
নেতি আর অস্তিত্বের মাঝে।
হঠাৎ রৌদ্রের ঘায়ে
যদিও এদিকে চলে ধুলামাটি ছাই
ঐ ওঠে শিশুদের গোপন হাসির
হঠাৎ সহস্র-ধারা পল্লব-ছায়ায়
শীগ্‌গির, এখনই, এখানে, এখনই, সর্বদাই—
উপহাস্য এই পোড়ো ম্রিয়মান কাল
আগে আর পরে দুই হাত পা ছড়ানো॥

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ॥ তিরিশের যুগে বাংলা কবিতায় মৌলিক রচনাগুণে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্বদেশী এবং বিদেশীয় চিত্রী-কবি-সাহিত্যিকদের বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর যে-সব আলোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, বর্তমান গ্রন্থে তা থেকে একটি সংকলন প্রকাশিত হল। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, পিকাসো-র মতো শিল্পী; ঈশ্বর গুপ্ত, আরাগঁ, সমর সেন, এলিঅট-এর মতো কবি; বীরবল, পরশুরাম, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো লেখককে নিয়ে বিশিষ্ট এই বাঙালী কবির আলোচনা একটি মাত্র গ্রন্থের পরিসরে পেয়ে সাহিত্যসন্ধিৎসুরা সুখী হবেন। দাম দুটাকা॥

মহৎ কাব্যের অনুবাদ নেই
কেবল পুনর্সৃষ্টি আছে
তাই
একভাষার রসকে
অন্যভাষায় উত্তীর্ণ করার কাজে
সার্থক কবিকেই সাজে।

বিষ্ণু দে

একাধারে অসামান্য কবি
ও বিদেশী সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত
তাই
তাঁর ভাষান্তরনে
এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি
টি এস্ এলিঅট
আমাদের ভাষায় মূর্ত হয়েছেন।
বাংলাকাব্যে
একটি নতুন সুর সংযোজিত হল।